MAQAM : Center For Sufi Heritage

৭/১৫, আজিজ মহল্লা, ব্লক এফ, জয়েন্ট কোয়ার্টার, মোহাম্মদপুর, ঢাকা - ১২০৭

সুলতানী আমলে সোনারগাঁয়ের সুফি-সমাজ ও তাঁদের কার্যক্রম

মুহাম্মদ নুরুজ্জামান রাফি ও মোহাম্মদ আবু সাঈদ

কি-ওয়ার্ড: সুলতানী আমল, সুলতান, সুফি-সমাজ, সোনারগাঁ, রাজধানী, ইসলাম, মসজিদ, খানকাহ

প্রবন্ধের যৌক্তিকতা:

বাংলার ইতিহাসে সুলতানী আমল (১৩৩৮-১৫৩৮) অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। বাংলায় মুসলমান সমাজের প্রতিষ্ঠা ও বিকাশ মূলত এ সময়টিতেই। সুলতানী আমলের বাংলা এই অর্থে স্বাধীন ছিল যে, বাংলার সুলতানগণ দিল্লির আনুগত্য মেনে নেননি। এই সময়ে বাংলার স্বাধীন সুলতানগণ কিছুকালের জন্য সোনারগাঁকে রাজধানী হিসেবে মনোনীত করেন। ভৌগলিক সুবিধাজনক অবস্থানের কারণে সোনারগাঁয়ের বিশেষ একটি গুরুত্ব ছিল। এরই প্রেক্ষিতে যখন বাংলার প্রথম স্বাধীন সুলতান ফখরুদ্দিন মোবারক শাহ সোনারগাঁকে রাজধানী হিসেবে ঘোষণা করলেন, তখন এটি সকলের নিকট গুরুত্বের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়। এরই ধারাবাহিকতায় অসংখ্য সুফি-দবরেশ, আউলিয়া এই অঞ্চলে আগমন করেন। একটি স্থিতিশীল পরিবেশ গড়ে তোলার লক্ষ্যে তাঁরা বহু মসজিদ, মাদ্রাসা, খানকাহ ও জনহিতকর কার্য সম্পাদন করেন এই সোনারগাঁয়ে। সুলতানী আমলের গুরুত্বপূর্ণ শহর হিসেবে সোনারগাঁয়ের সুফি-সমাজ ও তাঁদের সার্বিক কার্যক্রম কেমন ছিল তাঁরই একটি সংক্ষিপ্ত মূল্যায়ন করা হয়েছে বর্তমান নিবন্ধে।

উৎস:

পুরো সুলতানী আমল নিয়ে গবেষণা করেছেন বাংলাদেশের খ্যাতিমান ইতিহাসবিদ আবদুল করিম। তাঁর *বাংলার ইতিহাস সুলতানী আমল* এই নিবন্ধে ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা হয়েছে। বইটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৭৭ সালে। সুলতানী আমল বিষয়ে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ রেফারেন্স গ্রন্থ হিসেবে বইটি বিবেচ্য। সোনারগাঁয়ের সন্তান ড. হাবিবা খাতুনের *Iqlim SONARGAON History Jurisdiction Monuments* বইটিও তথ্য-উপাত্তের উৎস হিসেবে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। সুলতানী আমলে সোনারগাঁয়ের সুফিদের নির্মিত মসজিদের শিলালিপির জন্য আবদুল করিমের *CORPUS OF THE ARABIC AND PERSIAN INSCRIPTIONS OF BENGAL* বইটি ব্যবহার করা হয়েছে। ডক্টর পারভীন হাসানের *SULTANS AND MOSQUES* বইটিও কাজে এসেছে।

সুলতানী আমল:

১৩৩৮ সালে সুলতান ফখরুদ্দিন মোবারক শাহ সোনারগাঁকে রাজধানী হিসেবে ঘোষণা থেকে শুরু করে, ১৫৩৮ সালে শের শাহ'র গৌড় বিজয়ের মাধ্যমে বাংলার শাসনক্ষমতা আফগানদের নিয়ন্ত্রণে যাওয়া পর্যন্ত সময়কে 'সুলতানী আমল' হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

সুফি-সমাজ:

ইতিহাস ও স্থানীয়ভাবে যাঁরা সুফি, দরবেশ হিসেবে স্বীকৃত তাঁদেরকেই 'সুফি' হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। সোনারগাঁয়ের সুফিগণ যেহেতু পারস্পরিক বিচ্ছিন্ন ছিলেন না, বরং আদর্শ ও কার্যক্রমের মাধ্যমে যুক্ত ছিলেন সেহেতু সকলকে একত্রে 'সুফি-সমাজ' হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

ভূমিকা:

প্রাচীন বাংলার সমৃদ্ধ নগরী সোনারগাঁ একইসাথে রাজধানী হিসেবে যেমন প্রসিদ্ধ ছিল, সুবিধাজনক ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে তেমনই গুরুত্বপূর্ণ বন্দর হিসেবে পরিচিত ছিল। ইতিহাসে সোনারগাঁয়ের অবস্থান অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। কালের পরিক্রমায় বহু শাসক এই অঞ্চল শাসন করেছেন। ১২০৪-০৫ সালে মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খলজি বাংলা বিজয়ের মধ্য দিয়ে এই অঞ্চলের শাসনব্যবস্থায় মুসলমানদের অংশগ্রহণের সূচনা হয়। এরপর থেকে বাংলার শাসনব্যবস্থায় মুসলমানদের অংশগ্রহণ বাড়তে থাকে। বখতিয়ার খলজি থেকে শুরু করে ফখরুদ্দিন মোবারক শাহ পর্যন্ত বাংলায় যত মুসলমান শাসক ছিলেন সকলেই ছিলেন 'দায়িত্বপ্রাপ্ত', অর্থাৎ দিল্লির সুলতানদের অনুগত; বাংলার সরকারের কেন্দ্রীয় দফতর ছিল দিল্লিতে। কিন্তু ১৩৩৮ সালে ফখরুদ্দিন মোবারক শাহ রাজ্যক্ষমতা লাভ করে নিজেকে 'স্বাধীন' হিসেবে ঘোষণা করেন। বাংলার প্রথম কোনো মুসলিম শাসক হিসেবে ফখরুদ্দিন মোবারক শাহ যে শহর থেকে নিজেকে 'স্বাধীন সুলতান' ঘোষণা করেন তার নাম সোনারগাঁ। তখন থেকেই বাংলার রাজনীতিতে সোনারগাঁ হয়ে উঠে অপ্রতিরোধ্য। ১৫৩৮ সালে ইসলাম খাঁ'র নিকট হজরত ইব্রাহীম দানিশমন্দের নাতি মুসা খাঁ'র পরাজয়ের মাধ্যমে সোনারগাঁ'র সোনালী সময়ের পতন শুরু হয়। ১৩৩৮ থেকে ১৫৩৮- এই সময়ে সোনারগাঁয়ে আগমন করেছেন অসংখ্য সুফি, যারা ইসলাম প্রচারের পাশাপাশি সোনারগাঁয়ের সমাজ, সংস্কৃতি ও তৎকালীন শাসনব্যবস্থায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন।

সোনারগাঁয়ের ভৌগলিক অবস্থান:

সুলতানী আমলে ভৌগোলিক ও রাজনৈতিক গুরুত্ব বিবেচনায় সোনারগাঁ যে পরিমাণ সমৃদ্ধ ছিল, তার পরিচয় উপস্থাপন করা জরুরি। সুলতানী আমলের সোনারগাঁ ছোট কোনো এলাকা ছিল না। ইলিয়াস শাহের আমলে বাংলার তিনটি রাজ্যসীমার একটি ছিল সোনারগাঁ এবং এটি একটি প্রশাসনিক অঞ্চল হিসেবে পরিচিত ছিল। বর্তমানে যে স্থানকে 'সোনারগাঁ' নামে চিহ্নিত করা হয়, তা ছিল একই নামের রাজধানী শহর ও বন্দর। শহরটি উত্তর দিকে কাটরাবো পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। সোনারগাঁ ছিল বাংলার সুলতান শাসিত তিনটি প্রশাসনিক অঞ্চলের একটি; যথা— লক্ষ্ণৌতি, সাতগাঁও এবং সোনারগাঁ। সোনারগাঁ বাংলার দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব অংশে অবস্থিত ছিল এবং একই নামের একটি প্রাদেশিক রাজধানী ছিল।[1]

ইতিহাস প্রসিদ্ধ নগরী সোনারগাঁ এককালে শুধু বিরাট রাজধানীই ছিল না, বরং সুবিধাজনক ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে একই সঙ্গে এটি ছিল একটি সফল ব্যবসাকেন্দ্র, শিক্ষা-দীক্ষা ও শিল্প-সংস্কৃতির মিলনস্থল। সমুদ্রপথে বাংলার সাথে মধ্য ও দূরপ্রাচ্যের সংযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে মধ্যযুগের একটি অভ্যন্তরীণ সমৃদ্ধশালী বন্দর-নগরী হিসেবে সুপরিচিত হওয়ার পেছনে অবদান ছিল মেঘনার মতো বিশাল একটি নদীর তীরে এর অবস্থান। এর ফলে স্থানীয় জনসাধারণের সাথে বিদেশি বণিকদের অবাধ ব্যবসা-বাণিজ্যের দ্বার উন্মোচিত হয়। বিশ্ববিখ্যাত পর্যটক ইবনে বতুতা (১৩৪৫) এবং ব্রিটিশ রাজদরবারের প্রতিনিধি র‍্যালফ ফিচের (১৪০৬) পক্ষেও সোনারগাঁ পরিদর্শনের পথ সুগম হয়। এছাড়া, চীনা সম্রাট ইয়ংলের দূত মা হুয়ানেরও (১৫৮৬) আগমন ঘটে সোনারগাঁয়ে।

এ থেকে স্পষ্ট যে, সোনারগাঁ ছিল একটি গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল, যা বিশাল এক ভূখণ্ডকে নিয়ে গড়ে ওঠেছিল। এই অঞ্চলের মধ্যে একটি রাজধানী, একটি সাংস্কৃতিক কেন্দ্র এবং একটি নৌ-বন্দর ছিল। ধারণা করা হয়, সাংস্কৃতিক কেন্দ্রটি মোগরাপাড়ায় ছিল। কারণ হজরত শরফুদ্দীন আবু তাওয়ামা'র মাদ্রাসা ইসলামিক একাডেমি এবং পরবর্তীতে হজরত ইব্রাহীম দানিশমন্দের আস্তানা এই এলাকাতেই ছিল। সোনারগাঁকেন্দ্রিক গুরুত্বপূর্ণ নদীগুলো হলো—ব্রহ্মপুত্র, মেঘনা, পদ্মা, ধলেশ্বরী, শীতলক্ষ্যা, আড়িয়াল খাঁ, গয়রা সুন্দা, বালু, মধুমতি, ভৈরব, গড়াই, তুরাগ এবং বংশী। সুলতানি আমলে এর ভৌগোলিক সীমানা ছিল পশ্চিমে যমুনা, গড়াই, ভৈরব এবং কপোতাক্ষ নদ; পূর্বে মেঘনা ও ত্রিপুরা রাজ্য। উত্তরে ছিল কামরূপ রাজ্য; আর দক্ষিণে বিস্তৃত ছিল বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত।[2] এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, তৎকালীন সোনারগাঁ নদীবিধৌত হওয়ার কারণে এটি ভৌগলিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিকভাবে সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ ছিল।

১২০৪-০৫ সালের দিকে যখন ইখতিয়ারউদ্দিন মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খলজি নদীয়া অভিযান পরিচালনা করে সেন বংশের পতন ঘটিয়ে বাংলার মসনদে আরোহন করেন, তখন থেকে এই অঞ্চলে ব্যাপকভাবে মুসলিম সুফি-দরবেশদের আগমন ঘটে এবং এখানে ইসলামি সভ্যতা

1. Iqlim Sonargaon History Jurisdiction Monuments: Habiba Khatun, Academic Press And Publishers Library, Dhaka, 2006, 1
2. ibid, 4

ও সংস্কৃতির বিকাশ শুরু হয়।[3] কালক্রমে এখানে মুসলিম প্রচারক, ভ্রমণকারী ও বণিকদের আনাগোনা ঘটতে থাকে। বিখ্যাত মুহাদ্দিস হজরত শরফুদ্দীন আবু তাওয়ামা (রহ:) ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষদিকে সোনারগাঁয়ে এসে ইসলাম প্রচার করেন, ইলমুল হাদিসের দরস প্রদান করেন এবং একটি মাদ্রাসাও প্রতিষ্ঠা করেন, যেখানে দেশ-বিদেশের অসংখ্য শিক্ষার্থী দূরদূরান্ত থেকে জ্ঞানার্জনের জন্য সমবেত হতেন।

বর্তমানে সোনারগাঁ নারায়ণগঞ্জ জেলার আওতাধীন একটি উপজেলা। এর সীমানা: উত্তরে আড়াইহাজার ও রূপগঞ্জ উপজেলা, দক্ষিণে মুন্সিগঞ্জ সদর ও গজারিয়া উপজেলা, পূর্বে হোমনা ও গজারিয়া উপজেলা, পশ্চিমে বন্দর (নারায়ণগঞ্জ), নারায়ণগঞ্জ সদর ও রূপগঞ্জ উপজেলা ও ডেমরা থানা। পূর্ব বাংলার স্বর্ণযুগের রাজধানী সোনারগাঁ'র আমলে স্থাপত্য ও ইতিহাসের নিদর্শন বহু ইমারত, মসজিদ, মন্দির, মাযার আজও ভগ্নদশায় মোগড়াপাড়া, ভাকুরতলা ও আশে-পাশের গ্রামগুলো জুড়ে ছড়িয়ে রয়েছে। সুদীর্ঘ চারশত বছর ধরে সোনারগাঁ মুসলিম বাংলার কেন্দ্রবিন্দু ছিল। ইসলামী শাস্ত্র ও জ্ঞানের কেন্দ্র ছিল এই সোনারগাঁ। সেখানে ছিল মাদ্রাসা, মসজিদ, বিশ্ববিদ্যালয়ের মত প্রতিষ্ঠান। সোনারগাঁ-এ আজ গড়ে উঠেছে আমিনপুর, গোয়ালদী, পানাম আর মোগড়াপাড়া গ্রাম। প্রথমেই দেখা যাবে সেই সোনালী যুগের একটি মসজিদ। মোগড়াপাড়া বাজার, বাজারের অনতিদূরে শাহীতোরণ। তোরণ পার হয়ে রহবতখানা ও একটি ইমারত, যা ছিল সোনারগাঁয়ের শিক্ষাকেন্দ্রের একটি অংশ। তারপর কবরখানা পেরিয়ে হজরত ইব্রাহিম দানিশমন্দের মসজিদ। এর পশ্চিম দিকে হজরত আবু তাওয়ামা (রহ:) এর বাড়ির ভগ্নাবশেষ। এমন অসংখ্য ভগ্নাংবশেষের ভারবহন করে আজও ইতিহাসের গৌবরগাঁথার জানান দিচ্ছে সোনারগাঁ। এবং এখানেই একসময় রচিত হয়েছিল মুসলিম বাংলার ভিত।[4] কালের বিবর্তনে, প্রাকৃতিক বৈচিত্র্যে ও বিপর্যয়ে সোনারগাঁয়ের গৌবর ম্লান হয়েছে, ভৌগোলিক ও রাজনৈতিক গুরুত্বও কমেছে, তবে দিনে দিনে বেড়েছে তার ঐতিহাসিক গুরুত্ব। সোনারগাঁয়ের ঐতিহাসিক কদর আছে বলেই গবেষকরা এখনো তাকে নিয়ে গবেষণা করে, অনুসন্ধান করে সে আমলে নির্মিত স্থাপত্যশৈলী নিয়ে, উন্মোচন করতে চায় রহস্যের নতুন দ্বার। তাই বলা চলে, সোনারগাঁ ঐতিহাসিকভাবে এখনো অম্লান।

প্রথম পর্ব: প্রেক্ষাপট (১২৮০-১৩৩৮)

সুলতানী আমলে সোনারগাঁ তথা বাংলায় আগমনকারী সুফিরা এই অঞ্চলে সভ্যতা ও সংস্কৃতি গড়ে তুলতে যে অবদান রেখেছেন, তা অনস্বীকার্য। অসংখ্য সুফি-সাধক এই অঞ্চলে এসে ইসলাম প্রচার করেছেন। ইসলাম প্রচারের জন্য শহীদ হয়েছেন। শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিকাশের জন্য অসংখ্য মকতব, মসজিদ, মাদ্রাসা ও খানকাহ নির্মাণ করেছেন। এই সময় মুসলিম শাসকরাও সুফিদের সান্নিধ্যে এসেছেন এবং সুফিদের এমন কাজের পৃষ্ঠপোষকতাও করেছেন। সোনারগাঁয়ে সুফিদের আগমন প্রসঙ্গে বলা হয়, বাংলার যে কোনো নগরীর চাইতে সোনারগাঁয়েই অধিকহারে পীর-দরবেশ, আউলিয়ার সমাগম হয়। আধুনিক সোনারগাঁ'র বন-জঙ্গল ও পুরাকীর্তির ধ্বংসাবশেষের মধ্যে পীর-ফকিরদের কমপক্ষে অনেক মাযার ও চিল্লাখানা খুঁজে পাওয়া যাবে। এ প্রসঙ্গে ড. মুহম্মদ এনামুল হক বলেন, "অন্য স্থানের কথা বাদ দিলেও, একমাত্র ঢাকা জেলার সোনারগাঁ অঞ্চল দেড়শত জন সাধকের পাদস্পর্শে ধন্য হইয়াছিল বলিয়া জানিতে পারা যায়। ইহাদের আস্তানা বা দরগাহে সোনারগাঁ পরিপূর্ণ। সম্ভবতঃ এই কারণেই ইহাকে 'হজরত-ই-জালাল' বলা হয়।"[5]

আমাদের প্রেক্ষাপটের সময়সীমা ১২৮০ থেকে শুরু হয়েছে, হজরত শরফুদ্দীন আবু তাওয়ামাহ'র আগমনকে কেন্দ্র করে। এই সময়েই তিনি সোনারগাঁয়ে আগমন করেন এবং তার সঙ্গে ছিলেন তাঁর প্রিয় শিক্ষার্থী মাখদুমুল মুলক হজরত শায়খ শরফুদ্দীন ইয়াহইয়া মানেরী। আর প্রেক্ষাপটের শেষ সময় ১৩৩৮, ফখরুদ্দীন মোবারক শাহ কর্তৃক বাংলার প্রথম স্বাধীন সুলতান হিসেবে সিংহাসনে আরোহনের সময়কে কেন্দ্র করে। মূলত এই সময়ের মধ্যেই হজরত শরফুদ্দীন আবু তাওয়ামাহ সোনারগাঁয়ে ইসলামের দাওয়াত দেন, ইলমুল হাদিসের পাঠদান করেন এবং একটি মাদ্রাসা স্থাপন করেন যা পরবর্তীতে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে উন্নীত হয়েছিল। এরই প্রেক্ষিতে সোনারগাঁয়ে দেশ-বিদেশের শিক্ষানবিস, বিজ্ঞজন, ব্যবসায়ীবৃন্দ ও কলাকুশলীদের আগমন ঘটে। সোনারগাঁ পরিণত হয় একটি গুরুত্বপূর্ণ ইসলামী শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্রে। মূলত

3. বাংলার ইতিহাস: আবদুল করিম, বড়াল প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৯, ২০
4. হজরত আবু তাওয়ামাহ: মফিজ উদ্দীন আহমদ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৮৭, ২
5. মুহম্মদ এনামুল হক রচনাবলী দ্বিতীয় খণ্ড: মনসুর মুসা সম্পাদিত, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯৩, ২৫৪

হজরত শরফুদ্দীন আবু তাওয়ামাহ'র হাত ধরেই সোনারগাঁ একটি বিশ্বমানের শহরে উন্নীত হয় এবং পরবর্তীতে স্বাধীন বাংলার সুলতানী আমলে রাজধানী হওয়ার গৌরব অর্জন করে। সোনারগাঁকে আন্তর্জাতিকীকরণে হজরত শরফুদ্দীন আবু তাওয়ামাহ'র অবদান অনস্বীকার্য।

হজরত শরফুদ্দীন আবু তাওয়ামাহ (মৃ. ১৩০০ খ্রি.): সোনারগাঁ তথা বাংলাদেশে ইসলামি শিক্ষার বিকাশে যার নাম সবার প্রথমে আসে তিনিই হজরত শরফুদ্দীন আবু তাওয়ামাহ। ইলমুল হাদিস এবং শাস্ত্র শিক্ষাদানের জন্য তিনি একটি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। ইতোপূর্বে এত ব্যাপক আকারে মাদ্রাসা বাংলার কোথাও প্রতিষ্ঠিত হয়নি এবং এখানে দেশ-বিদেশের অসংখ্য শিক্ষার্থী জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চার জন্য সমবেত হয়েছিল। তাই তাঁকে বাংলাদেশের ইসলামি শিক্ষার পথিকৃৎ হিসেবেও আখ্যা দেওয়া হয়।[6]

হজরত আবু তাওয়ামাহ ১২৬০ সালের দিকে বুখারা থেকে দিল্লিতে আগমন করেন। সেখানে কিছুদিন অবস্থান করেন এবং ১২৮২ থেকে ১২৮৭ সালের দিকে সোনারগাঁয়ে আগমন করেন। পথিমধ্যে তিনি কিছুদিন বিহারের মানার নামক একটি গ্রামে অবস্থান করেন। এখানেই হজরত শরফুদ্দীন ইয়াহইয়া মানেরী তাঁর সাক্ষাৎ লাভ করেন এবং হযরতের পাণ্ডিত্য দেখে মুগ্ধ হন এবং হযরতে শিষ্যত্ব লাভের জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেন। হজরত আবু তাওয়ামাহ, হজরত ইয়াহইয়া মানেরী'র বিনয় এবং জ্ঞানার্জনের প্রতি প্রবল ঝোঁক দেখে তাঁকে শিষ্য হিসেবে গ্রহণ করেন।[7]

জ্ঞানতাপস মাওলানা শরফুদ্দীন আবু তাওয়ামার নেতৃত্বে সে সময়ের সোনারগাঁ ইসলামি শিক্ষা ও জ্ঞানচর্চার কেন্দ্রে পরিণত হয়। সোনারগাঁয়ে আবু তাওয়ামা তাঁর খানকাহ ও একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। এখানে ইসলামী ধর্মতত্ত্ব ও বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় শিক্ষাদান করা হতো। অল্প কয়েক বছরের মধ্যেই জ্ঞানতাপস মাওলানা শরফুদ্দিনের নিষ্ঠায় এর খ্যাতি সারাবিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে। ইতিহাস বলে, এই বিশ্ববিদ্যালয় সুলতান গিয়াসউদ্দিন আজম শাহের শাসনামল পর্যন্ত বহাল তবিয়তে ছিল। গিয়াসউদ্দীন আজম শাহ রাজা গণেশের চক্রান্তে খুন হলে এই বিশ্ববিদ্যালয়টিও ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে উপনীত হয়। এরপর ইলিয়াস শাহী বংশের পতনের পর যখন রাজা গণেশ ক্ষমতা গ্রহণ করে, তখন থেকে বিশ্ববিদ্যালয়টি সম্বন্ধে আর কিছু জানা যায় না। সম্ভবত রাজা গণেশ বিশ্ববিদ্যালয়টি ধ্বংস করে দেয়। রিয়াজুস সালাতিন থেকে রাজা গণেশের মুসলিম-বিদ্বেষী মনোভাব ও কার্যক্রমের ব্যাপারে নিশ্চিত ধারণা পাওয়া যায়। রাজা গণেশ মুসলিমদের পঙ্গু করার উদ্দেশ্যে প্রথমেই আঘাত হানে এদেশের শিক্ষাব্যবস্থায়। সেই সময় এই বিশ্ববিদ্যালয়টিও বন্ধ হয়ে যায়।

বাংলাদেশে প্রথম ইসলামী শিক্ষার আলোকবর্তিকা হজরত আবু তাওয়ামা সম্ভাব্য ১৩০০ সালে ইন্তেকাল করেন। আর সুলতান গিয়াসউদ্দীন আযম শাহ ইন্তেকাল করেন ১৪১১ সালে। অতএব বলা যায়, হজরত শরফুদ্দীন আবু তাওয়ামা কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয়টি ১০০ বছরেরও অধিক সময় টিকে ছিলো।

হজরত শরফুদ্দীন ইয়াহইয়া মানেরী (১২৬২-১৩৮০ খ্রি.): হজরত শরফুদ্দীন ইয়াহইয়া মানেরী তাঁর শ্রদ্ধেয় শিক্ষক হজরত আবু তাওয়ামাহ'র সাথে সোনারগাঁয়ে আগমন করেন। তখন তিনি প্রাপ্তবয়স্ক ছিলেন এবং তাঁর বয়স ছিল বিশ বছরের কাছাকাছি। ইসলামী জ্ঞানচর্চার প্রতি প্রবল আগ্রহ ছিল বলেই তিনি সোনারগাঁয়ে আসেন এবং হজরত আবু তাওয়ামাহ'র প্রতিষ্ঠিত মাদ্রাসায় পড়াশোনা করেন এবং এখানেই তিনি পড়াশোনা শেষ করেন। এরপর তিনি স্বীয় যোগ্যতায় শিক্ষকের মন জয় করেন এবং হজরত আবু তাওয়ামাহ'র কন্যার সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন।[8]

বিভিন্ন ঐতিহাসিকের বরাতে জানা যায়, হজরত শরফুদ্দীন ইয়াহইয়া মানেরী খুব বেশিদিন সোনারগাঁয়ে ছিলেন না। তিনি প্রাতিষ্ঠানিক জ্ঞানার্জন সম্পন্ন করে ত্রিশ বছর বয়সে সোনারগাঁ ছেড়ে যান।[9] তিনি মূলত তাঁর শিক্ষকের ইন্তেকালের পরেই সোনারগাঁ ত্যাগ করেন। ততোদিনে তিনি সুফিতত্ত্বের সুধা পান করে ফেলেছিলেন। তিনি বেশিরভাগ সময় সাধনা ও ধ্যানের মধ্যে কাটিয়ে দিতেন। সোনারগাঁ থেকে তিনি প্রথমে তাঁর

6. শরফুদ্দীন আবু তাওয়ামাহ, শরফুদ্দীন ইয়াহইয়া মুনায়রী ও নুর কুতুবুল আলম (র:) সাধকত্রয়ের জীবন ও কর্মের উপর তুলনামূলক সমীক্ষা: মুহাম্মদ আব্দুল লতিফ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০১, ১২৮

7. Social History of the Muslims in Bengal: Dr. Abdul Karim, The Asiatic Society of Pakistan, Dacca, 1959, 72

8. Shaykh Sharaf-ud-Din Ahmad Yahya of Munayr: Rahman S. K., The Calcutta Review, 1939, 71-197

9. Karim, ibid, 99

মায়ের সাথে দেখা করেন এবং সুফি-সাধনার চর্চা করতে মায়ের অনুমতি প্রার্থনা করেন। মায়ের অনুমতি নিয়ে তিনি বিভিন্ন সুফির সান্নিধ্য লাভ করেন। তিনি মাখদুমুল মুলক উপাধীতে ভূষিত ছিলেন।[10]

হজরত শাহজালাল ইয়ামেনী (মৃ. ১৩৪৬ খ্রি.): বাংলায় ইসলাম প্রচারে হজরত শাহজালালের যে অবদান তা সকলেরই জানা। কিংবদন্তী আছে, হজরত শরফুদ্দীন আবু তাওয়ামাহ, হজরত শাহজালাল ইয়ামেনীর একজন সঙ্গী হিসেবে বিহারে বেশ কিছুকাল অবস্থান করে ইসলাম প্রচারের কাজে নিয়োজিত থাকেন এবং পরবর্তীতে সোনারগাঁয়ে আগমন করে হজরত শাহজালালের সোহবত ও ফয়েজ হাসিল করেন। দেওয়ান নুরুল আনোয়ার হোসেন চৌধুরী তার *হজরত শাহজালাল (রহ.)* গ্রন্থে বিস্তারিতভাবে আলোচনার মাধ্যমে এটা প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে, হজরত শরফুদ্দীন আবু তাওয়ামাহ ও শরফুদ্দীন ইয়াহইয়া মানেরী উভয়েই হজরত শাহজালালের সোহবত তথা সান্নিধ্য লাভের জন্যেই মূলত সোনারগাঁয়ে আগমন করেন। তিনি আরো বলেন, হজরত শাহজালালই সোনারগাঁয়ে আগত দরবেশদের পূর্বসূরী ছিলেন।[11] হজরত শাহজালালের সান্নিধ্য লাভের জন্য ইবনে বতুতার বাংলায় আগমনের ঘটনাকে বিবেচনায় নিলে উক্ত দাবি নাকচ করা যায় না। পাশাপাশি হজরত শরফুদ্দীন আবু তাওয়ামাহ ও শরফুদ্দীন ইয়াহইয়া মানেরী উভয়ে যখন সোনারগাঁয়ে অবস্থান করেন তখন হজরত শাহজালাল সিলেটে অবস্থান করছিলেন, অর্থাৎ সমসাময়িক। আবার উক্ত দাবির পক্ষে জোরালো কোনো তথ্য যেহেতু মিলছে না সেহেতু এটিকে 'সত্য' বলে গণ্য না করে স্রেফ 'দাবি' হিসেবেই গণ্য করা যেতে পারে।

বিখ্যাত পর্যটকদের বর্ণনায় সোনারগাঁ:

বিশ্ববিখ্যাত ভ্রমণকারী ইবন বতুতা (১৩০৪-১৩৬৯ খ্রি.) ১৩৪৫ খ্রিস্টাব্দে এদেশে ও সোনারগাঁয়ের ব্যস্ততম বন্দরনগরে আসেন। সে সময় সোনারগাঁয়ের শাসক ছিলেন ফখরুদ্দিন মুবারক শাহ (মৃ. ১৩৪৯ খ্রি.)। তিনি রাজধানীতে বহু সাধকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন। তাঁর বর্ণনায়, নদীবন্দরটি অসংখ্য জাহাজে ভরপুর ছিল যা জাভা ও অন্যান্য স্থানে যাত্রার জন্য প্রস্তুত ছিল। এই অঞ্চলে কৃষিপণ্যের অস্বাভাবিক সস্তা মূল্য এবং ফলের প্রাচুর্য দেখে তিনি বিমোহিত হয়েছিলেন এবং এর বর্ণনা তার বিখ্যাত ভ্রমণগ্রন্থেও উল্লেখ করেছেন। এছাড়া, চীনা সম্রাট ইয়ংলের দূতাবাসের একজন দোভাষী মা হুয়ান, সুলতান গিয়াসউদ্দিন আজম শাহের দরবারে (১৪০৬ খ্রি.) আসেন এবং একটি আকর্ষণীয় বিবরণ রেখে যান। তাঁর লেখায় তিনি সোনারগাঁয়ে উৎপাদিত তুলোর কাপড়ের অতুলনীয় সূক্ষ্মতা ও বৈচিত্র্যে বিস্ময় প্রকাশ করেছেন। তিনি প্রাচীরবেষ্টিত শহরটি পরিদর্শন করেন এবং রাজদরবারের ঐশ্বর্যের ভূয়সী প্রশংসা করেন।[12]

দ্বিতীয় পর্ব: সুলতানী আমলে সোনারগাঁয়ের সুফি সমাজ (১৩৩৮-১৫৩৮)

এই পর্বে আমরা এমন কয়েকজন বিশেষ সুফি-সাধকদের নিয়ে আলোচনা করেছি, যারা সুলতানী আমলে সোনারগাঁয়ে ইসলাম প্রচারের পাশাপাশি সমাজ ও সংস্কৃতিতে বিশেষ ভূমিকা রেখেছেন।

১. হজরত শায়খ আলাউল হক (রহ.):

হজরত শায়খ আলাউল হক ছিলেন একজন বিখ্যাত সুফি এবং হজরত শায়খ আখি সিরাজুদ্দীন উসমানের শিষ্য ও খলিফা। তিনি ছিলেন বিখ্যাত কুরাইশ বংশের হাশেমী গোত্রীর এবং তাঁর বংশধারা সাহাবি হজরত খালিদ বিন ওয়ালিদের সঙ্গে যুক্ত ছিল। সুলতান সিকান্দার শাহ'র আমলে শায়খ আলাউল হক পাণ্ডুয়ায় মসজিদ, মাদ্রাসা, খানকা ও লঙ্গরখানার এক ব্যাপক আয়োজন করেন। তাঁর মাদ্রাসায় বাংলার বাইরে থেকেও পড়াশোনার জন্য শিক্ষার্থীরা আসতেন; তাঁর খানকায় বসবাস করতেন অসংখ্য সুফি, দরবেশ এবং লঙ্গরখানায় তিনি শিক্ষার্থী, দরিদ্র ও পথিকদের খাওয়ানোর জন্য বিপুল অর্থ ব্যয় করতেন। জনপরিসরে তাঁর এমন এলাহী কারবার দেখে সুলতান চিন্তিত হয়ে পড়েন। ফলে সুলতান সিকান্দার শাহ তাঁকে রাজধানী পাণ্ডুয়া ছেড়ে সোনারগাঁ যেতে নির্দেশ দেন। নির্দেশনা মোতাবেক তিনি সোনারগাঁয়ে হিজরত করেন এবং সেখানেও যথারীতি খানকা ও লঙ্গরখানা প্রতিষ্ঠা করেন। আশ্চর্যের বিষয় হলো, খানকা ও লঙ্গরখানা বাবদ পাণ্ডুয়ার তুলনায় সোনারগাঁয়ে তিনি দ্বিগুণ অর্থ ব্যয় করতেন। সিকান্দার শাহ'র ইন্তেকালের পর সুলতান গিয়াসউদ্দিন আজম শাহ'র অনুরোধে তিনি আবার পাণ্ডুয়ায় ফিরে

10. Rahman, ibid

11. হজরত শাহজালাল (রহ.): দেওয়ান নুরুল আনোয়ার হোসেন চৌধুরী, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৮৭, ১০৫-৮

12. Khatun, ibid, 2

যান।[13] সিকান্দার শাহ'র ইন্তেকাল ১৩৯০ সালে; এ মোতাবেক ১৩৮৮/৮৯ সালে শায়খ আলাউল হক সোনারগাঁয়ে হিজরত করে থাকতে পারেন। কিন্তু সোনারগাঁয়ের ঠিক কোথায় তিনি খানকা ও লঙ্গরখানা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তার সঠিক অবস্থান নির্ণয় করা যায়নি। উল্লেখ্য যে, সুলতান গিয়াসউদ্দীন আযম শাহ হজরত আলাউল হকের মুরিদ ছিলেন এবং তাঁর কাছ থেকে বিভিন্ন দিকনির্দেশনা গ্রহণ করতেন।[14] (খাতুন: ২০০৬, ৩২) এছাড়া, সুলতানের পিতামহ সুলতান শামসউদ্দীন ইলিয়াস শাহ হজরত আলাউল হকের সম্মানে একটি মসজিদ নির্মাণ করেছিলেন।[15] অর্থাৎ, সুলতান শামসউদ্দীন ইলিয়াস শাহ, সিকান্দার শাহ এবং গিয়াসউদ্দীন আযম শাহ- তিনজনের সঙ্গেই শায়খ আলাউল হকের সরাসরি সম্পর্ক ছিল।

২. হজরত খান জাহান আলী রহ.:

হজরত খান জাহান আলী ১৪১১ থেকে ১৪৫৯ সালে বাগেরহাট অঞ্চলে যে রাজ্য পরিচালনা করেছিলেন, তা ছিল প্রসাশনিক অঞ্চল সোনারগাঁয়ের আওতাধীন[16]। ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের পশ্চিম দিকে প্রাচীন গিরদী-কিলা এলাকায় নসওয়াল গলি নামক রাস্তায় একটি প্রাচীন তোরণ ও মসজিদ ছিল। বর্তমানে এই মসজিদটির কোনো অস্তিত্ব নেই, তবে এই মসজিদের শিলালিপি 'বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরে' সংরক্ষিত আছে। মসজিদটি ১৪৫৯ সালে হজরত খান জাহান আলী রহ.-এর নির্দেশে নির্মিত হয়েছিল বলে জানা যায়।[17] বিভিন্ন ইতিহাস গ্রন্থ পর্যালোচনা করে দেখা যায়, তিনি মূলত খুলনা-যশোর এলাকাকে কেন্দ্র করে রাজ্য পরিচালনা করেছিলেন। তবে ড.হাবিবা খাতুন উল্লেখ করেছেন, ময়মনসিংহ ও পুরান ঢাকায় দুটি মসজিদ পাওয়া গিয়েছে যা তাঁর আমলে এবং তাঁর নির্দেশে তৈরি হয়েছে।
তিনি সুলতান গিয়াসউদ্দীন আযম শাহের আমলে ওয়াজির ও সুলতান নাসিরউদ্দীন মাহমুদ শাহের সময়ে উলুঘ (তুর্কি শব্দ, অর্থ নেতা) উপাধি লাভ করেন। ১৪১১ সালে সুলতান গিয়াসউদ্দীন আযম শাহ রাজা গণেশ কর্তৃক নিহত হলে খান জাহান আলী পাণ্ডুয়া থেকে বাগেরহাট অঞ্চলে আগমন করেন। তিনি নিজে একজন খ্যাতনামা সুফিসাধক ছিলেন, পাশাপাশি একজন সামাজিক ও রাজনৈতিক শাসকও ছিলেন যিনি দক্ষিণ বাংলায় 'খলিফাতাবাদ' নামে একটি স্বাধীন রাজ্য গড়ে তোলেন। তিনি দক্ষিণের বিস্তৃত অরণ্য অঞ্চল শাসন করতেন এবং বাইরে থেকে কারও অধীনস্থ না হয়েও কেবল ইলিয়াস শাহের বংশধরদের প্রতিই আনুগত্য প্রদর্শন করতেন।[18]

৩. হজরত নুর কুতুবুল আলম (রহ.):

হজরত নুর কুতুবুল আলমের খানকাহ ছিল পান্ডুয়ায়। তবে আধ্যাত্মিক সাধনা ও সামাজিক-রাজনৈতিক সচেতনতার ফলে তিনি তখন বাংলার সুফিদের নেতৃত্বস্থানীয় হয়ে ওঠেন। তাঁর প্রভাব সারা বাংলায় ছড়িয়ে পড়ে, সোনারগাঁ সেই প্রভাব থেকে বাদ পড়েনি। সোনারগাঁয়ের সাথে হজরত নুর কুতুবুল আলম রহ. এর সম্পকর্কে এভাবে বর্ণনা করা যায় যে, রাজা গণেশকে শায়েস্তা করার জন্য জৈনপুরের সুলতান ইব্রাহিম শার্কী যখন বাংলায় আসেন, তখন ভয়ে রাজা গণেশ হযরতের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে। তার ভুল শোধরানের জন্য হজরত তাকে একটি সুযোগ দেন এবং মুসলমানদের প্রতি সহনশীল হতে নির্দেশ দেন। অতঃপর আশু সংঘাত এড়াতে জৈনপুরের সুলতানের সাথে মধ্যস্থতা করে বাংলা আক্রমণে বিরত রাখেন। এতে করে সোনারগাঁয়ের রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা এবং সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ধারাবাহিকতা বজায় ছিল। অপরদিকে হজরতের পুত্র আনোয়ার ও পৌত্র হজরত জায়েদকে রাজা গণেশ সোনারগাঁয়ে নির্বাসিত করার মাধ্যমেও পারিবারিকসূত্রে হযরতের সাথে সোনারগাঁয়ের একটি যোগসূত্র স্থাপিত হয়।

রাজা গণেশ যখন দ্বিতীয়বারের মতো মুসলমানদের উপর নির্যাতনের সীমা অতিক্রম করছিল তখন হজরত আনোয়ার তাঁর পিতা নুর কুতুবুল আলমের নিকট গণেশের বিরুদ্ধে নালিশ করেছিলেন। তখন নুর কুতুবুল আলম বলেছিলেন, যেদিন এই মাটি তোমার রক্তে রঞ্জিত হবে, সেদিন এই জুলুম বন্ধ হবে। হযরতের এই শর্ত পরবর্তীতে বাস্তবে রূপান্তরিত হয়। কিছুদিন পর রাজা গণেশের নির্দেশে হজরত আনোয়ারকে সোনারগাঁয়ে নির্বাসন দেয়া হয় এবং হত্যা করা হয়। যেদিন হজরত আনেয়ার সোনারগাঁয়ে শহিদ হন, সেদিনই রাজা গণেশ পাণ্ডুয়ায় মৃত্যুবরণ করে।[19]

13. মুহম্মদ এনামুল হক রচনাবলী চতুর্থ খণ্ড: মনসুর মুসা সম্পাদিত, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯৫, ১৭০
14. Khatun, ibid, 32
15. Karim, ibid, 53
16. ibid, 130
17. ibid, 82
18. ibid, 38
19. বাংলার ইতিহাস (রিয়াজ-উস সালাতীনের বঙ্গানুবাদ): আকবরউদ্দীন, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৭৪, ৮৮-৯০

৪. হাজী বাবা সালেহ (রহ.):

হাজী বাবা সালেহ সুলতান জালালউদ্দীন ফাতেহ শাহ (হজরত ফাতেহ শাহ) এবং সুলতান আলাউদ্দীন হুসাইন শাহের আমলে দীর্ঘ ছাব্বিশ বছর (১৪৮১-১৫০৬) ধরে সোনারগাঁয়ের গভর্নর হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।[20] পরপর দুইজন শাসকের আমলে স্বপদে বহাল থাকার নজিরই প্রমাণ করে তিনি অত্যন্ত সুদক্ষ ও সুযোগ্য একজন প্রসাশনিক ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তিনি শুধু একজন দক্ষ প্রসাশকই ছিলেন না; বরং একজন প্রসিদ্ধ আল্লাহওয়ালা বুযুর্গও ছিলেন। এছাড়া তিনি একজন স্থাপত্যনির্মাতাও ছিলেন। নিজস্ব তত্ত্বাবধানে তিনি একাধিক মসজিদ নির্মাণ করেছেন।

৫. বাবা শাহ লঙ্গর (রহ.):

প্রচলিত কাহিনী অনুযায়ী বলা হয়, তিনি বাগদাদের একজন রাজপুত্র ছিলেন, যিনি সংসার ত্যাগ করে বিভিন্ন দেশে ঘুরে বেড়িয়েছিলেন এবং শেষমেশ সোনারগাঁয়ে এসে মৃত্যুবরণ করেন। সাম্প্রতিক গবেষণায় জানা গেছে যে, শাহ লঙ্গর ছিলেন বিখ্যাত সুফি শাহ মোজাফ্ফর বালখির নাতি, যিনি একজন মহান ধর্মতাত্ত্বিক এবং সুলতান গিয়াসউদ্দিন আজম শাহের সমসাময়িক ছিলেন। তিনি ছিলেন দিল্লিতে সুলতান ফিরোজ শাহ তুঘলকের কুশক-ই-লাল মাদ্রাসার শিক্ষক এবং একই সঙ্গে শেখ শরফুদ্দিন ইয়াহিয়া মানেরির খলিফা।[21]

তাঁর পূর্ণ নাম ছিল শেখ আহমদ লঙ্গর, যিনি ১৪৮৭ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন। শাহ লঙ্গরের দরগাহ সোনারগাঁ থানার মুয়াজ্জমপুর (মহজমপুর) গ্রামে মুয়াজ্জমপুর শাহী মসজিদের দেয়ালঘেরা প্রাঙ্গণে অবস্থিত। প্রাঙ্গণের দক্ষিণ অংশে উন্মুক্ত দেয়াল বেষ্টনীর অভ্যন্তরে রয়েছে শাহ লঙ্গরের সমাধি। মসজিদ প্রাঙ্গণের প্রবেশপথের ডান পাশে শাহ লঙ্গরের সমাধির সন্নিকটে রয়েছে একটি পুরনো কূপ। কূপটি অদ্যপি ছেদ-কুয়া (ভূগর্ভস্থ নালা বিশিষ্ট কূপ) নামে অভিহিত।

৬. হজরত সাইয়্যিদ ইব্রাহিম দানিশমন্দ (রহ.):

সাইয়্যিদ ইবরাহিম দানিশমন্দ (রহ.) হোসেনশাহী বংশের শেষ সুলতান গিয়াসুদ্দিন মাহমুদ শাহের (১৫৩৩-১৫৪০) শাসনামলে অথবা এর কিছুকাল পূর্বে পারস্য থেকে বাংলায় আসেন। সুলতান মাহমুদ শাহের জ্যেষ্ঠ কন্যার সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয় এবং তাঁকে দক্ষিণ শ্রীহট্টের অন্তর্গত তরফের শাসনকর্তা নিয়োগ করা হয়। ইবরাহিম দানিশমন্দকে মালিক-উল-উমারা (আমীরদের প্রধান) উচ্চ রাজকীয় খেতাবে ভূষিত করা হয়। সুলতান তাঁকে সোনারগাঁয়ে লা-খারাজ (রাজস্বমুক্ত) ভূমি বন্দোবস্ত দান করেন। ঘটনাক্রম ও তথ্যউপাত্ত থেকে প্রতীয়মান হয় যে, সাইয়্যিদ দানিশমন্দ হোসেনশাহী বংশের পতনের (১৫৪০) পরও এবং সম্ভবত ষোড়শ শতকের ষাটের দশক পর্যন্ত তরফে শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিলেন। এরপর তিনি সোনারগাঁয়ে এসে মোগরাপাড়ায় বর্তমান দরগাহবাড়ি স্থলে তাঁর খানকা প্রতিষ্ঠা করেন।

সাইয়্যিদ ইবরাহিম দানিশমন্দ ইসলামী ধর্মতত্ত্ব এবং এর সকল শাখায় বিশেষত তাসাওয়াফ বিষয়ে অসাধারণ পাণ্ডিত্যের অধিকারী ছিলেন। ধর্মতত্ত্ব, ইসলামী আইনবিধান, তাসাউফ এবং একজন বহুমুখী বিদগ্ধ লেখক হিসেবে তিনি তাঁর প্রজ্ঞার জন্য 'দানিশমন্দ' নামে অভিহিত হন। তিনি 'কুতবুল আশেকীন' খেতাবেও ভূষিত হন। কাদেরিয়া তরিকার যে-সকল সুফি দরবেশ বাংলায় এই সুফি তরিকার প্রচারকার্যে নিয়োজিত ছিলেন, ইবরাহিম দানিশমন্দ সম্ভবত ছিলেন তাদের অন্যতম। দরগাহবাড়িতে তাঁর প্রতিষ্ঠিত খানকা থেকে তিনি সুফি তরিকার প্রচার এবং ইসলামী বিষয় শিক্ষাদানের এক মহতী ঐতিহ্যের সূচনা করেন।

সাইয়্যিদ ইবরাহিম দানিশমন্দ সোনারগাঁয়ের দরগাহবাড়িতে এক সৌধের অভ্যন্তরে সমাহিত আছেন, যা ফাতেহ শাহ মসজিদের নিকটে অবস্থিত। দরগাহবাড়ি সমাধিস্থলের পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত তাঁর সমাধিসৌধটি কুটির আকৃতির চৌচালা গম্বুজাকার ছাদবিশিষ্ট একটি চতুর্ভুজাকৃতির ইমারত।[22]

---

20. Khatun, ibid, 50

21. ibid, 147

22. বাংলাপিডিয়া, মুয়াযযম হুসায়ন খান

তৃতীয় পর্ব: সুফিদের কার্যক্রম

সুফিদের জীবনচর্চা ও কার্যক্রম থেকে আমরা দেখতে পাই যে তারা কেবল খানকাহর ভেতরেই সীমাবদ্ধ থাকেননি; বরং মানুষের চিন্তাভাবনা, আচার-আচরণ ও সামগ্রিক জীবনে গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। ড. আব্দুল করিম, মীর সৈয়দ আশরাফ জাহাঙ্গীর সিমনানীর বরাত দিয়ে বলেন, ''এমন কোনো নগর বা গ্রাম নেই যেখানে কোনো সাধক এসে বসতি স্থাপন করেননি।'' ইতিহাস, ঐতিহ্য, সাহিত্য ও শিলালিপি থেকে পাওয়া দলিলগুলো বলে দেয় যে, সুফিদের উপস্থিতি ও প্রভাব যথেষ্ট শক্তিশালী ও বিস্তৃত ছিল।[23]

তাঁরা এই দেশে এসে খানকাহ প্রতিষ্ঠা করেছেন, শিষ্য, ভক্ত ও অনুরাগী গড়ে তুলেছেন, আধ্যাত্মিক শিক্ষা দিয়েছেন এবং অনেকেই এখানে স্থায়ীভাবে বসতি করেছেন। ফলে তারা মুসলিম সমাজে শাসক শ্রেণি ও আলেমদের পাশাপাশি এক নতুন শক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন। শুধু তাদের দরগাহগুলোর ভৌগোলিক অবস্থান লক্ষ্য করলেই বোঝা যায়, তারা কেবল শহরকে কেন্দ্র করেই সীমাবদ্ধ ছিলেন না; বরং সারা বাংলার বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়েছিলেন- পূর্বের চট্টগ্রাম ও সিলেট থেকে পশ্চিমের বর্ধমানের মঙ্গলকোট, দক্ষিণের বাগেরহাট ও পাণ্ডুয়া থেকে উত্তরের রংপুরের কান্তাদুয়ার পর্যন্ত। আজও এসব দরগাহ ও মাজারে শত শত ভক্ত-অনুরাগী ভক্তি ও শ্রদ্ধাভরে সমবেত হয়। দুনিয়ার হায়াতে তাঁদের যেমন প্রভাব ছিল, মৃত্যুর পরেও সেই প্রভাব সমাজে বিদ্যমান রয়েছে। সুলতানী আমলের সোনারগাঁয়ে সুফিদের যে কার্যাবলী তা রাজনৈতিক ও সামরিক শক্তি বিস্তারে, শাসকগোষ্ঠীর উপর প্রভাব বিস্তারে, ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক শিক্ষার প্রসারে ও সাধারণ মানুষের মধ্যে সামাজিক মূল্যবোধের বীজ বোপণের মাধ্যমে কার্যকর ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়েছিলো।

সুলতানী আমলে সোনারগাঁয়ের সুফিরা ইসলাম প্রচারের অংশ হিসেবেই শিক্ষা, সমাজ, সংস্কৃতি, স্থাপত্য ও রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করেছেন। সোনারগাঁয়ের যে ইতিহাস-ঐতিহ্যের ব্যাপারে কিংবদন্তি আছে তাতে তৎকালীন সুফিদের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রয়েছে।

রাজনৈতিক

সুলতানী আমলের প্রেক্ষাপট বিবেচনায় হজরত শরফুদ্দীন আবু তাওয়ামাহ'র বিষয়ও প্রাসঙ্গিক। তিনি সরাসরি রাজনীতিতে জড়িত না হলেও তাঁর প্রিয় ছাত্র হজরত বদরউদ্দীন যায়েদ প্রকাশ বদর পীরকে চট্টগ্রামে পাঠিয়েছিলেন সেখানে মগদের হাতে নির্যাতিত মুসলমানদেরকে হেফাজত করতে। সেখান থেকে ফিরে আসার পর আবার তাঁকে দিনাজপুরে অত্যাচারী রাজা মহেশের বিরুদ্ধে অভিযানে প্রেরণ করেন। সেখানে হজরত বদরউদ্দীন যায়েদ গৌড়ের সুলতান আলাউদ্দীন হুসেন শাহের সাহায্যে রাজা মহেশকে পরাজিত করেন।[24] খেয়াল করলে দেখা যাবে, শরফুদ্দীন আবু তাওয়ামাহ নিজে রাজনীতিতে সরাসরি জড়িত না হলেও রাজনৈতিকভাবে সচেতন ছিলেন বিধায় তাঁর শিষ্যকে পাঠিয়েছিলেন একাধিক যুদ্ধে যোগ দিতে।

শাসনব্যবস্থায়

শাসনব্যবস্থায় সুফিদের অংশগ্রহণ বাংলায় মোটেও বিচিত্র কিছু নয়। হজরত শাহজালালের সিলেট বিজয়ের পর তাঁর সঙ্গীদের অনেককে স্থানীয় বিভিন্ন অঞ্চলের শাসনব্যবস্থার দায়িত্ব গ্রহণ করতে হয়েছিলো। সুলতানী আমলে সোনারগাঁয়ের কতিপয় সুফি শাসনব্যবস্থার সঙ্গে জড়িত ছিলেন। যেমন:

ক) সুলতান ফাতেহ শাহ (রহ.):

সুলতান ফাতেহ শাহ ছিলেন ইলিয়াস শাহী বংশের শেষ শাসক। তিনি উত্তরাধীকারসূত্রে পাওয়া রাজ্য অক্ষুণ্ন রাখতে সচেষ্ট ছিলেন। তিনি ১৪৮১ সাল থেকে ১৪৮৭ সাল পর্যন্ত মোট সাত বছর বাংলা শাসন করেন। তাঁর সময়কার বিভিন্ন শিলালিপি বিশ্লেষণ করে জানা যায়, তিনি ঢাকা, রাজশাহী, গৌড়ের মাহদীপুর ও হুগলি জেলার সাতগাঁও পর্যন্ত শাসনকার্য পরিচালনা করেছেন। তার ইন্তেকালের সাথে সাথে ইলিয়াস শাহী বংশের পতন ঘটে।

---

23. Karim, ibid, 124

24. লতিফ, প্রাগুক্ত, ১৩৪

সুলতান ফাতেহ শাহ অত্যন্ত জ্ঞানী এবং বুদ্ধিমান মানুষ ছিলেন। গৌড়ের মাহদীপুরের গুনমনত মসজিদে প্রাপ্ত শিলালিপিতে বলা হয়েছে, সুলতান ফাতেহ শাহ ছিলেন সুলতান আল-সালাতিন, জলে ও স্থলে সাহসী যোদ্ধা, পবিত্র কুরআন শরিফের রহস্য উদ্ঘাটনকারী এবং ধর্মীয় ও শারিরীক বিদ্যায় পারদর্শী।[25]

খ) হজরত খান জাহান আলী (রহ.)

বাগেরহাটের সাথে এই মহান সাধকের নাম ওতোপ্রতোভাবে জড়িত। বাগেরহাট যে সমস্ত সুফি-দরবেশদের বদন্যতায় ইসলামী সমাজ ও সংস্কৃতিতে সমৃদ্ধ হয়েছিল, তারমধ্যে হজরত খান জাহান আলী রহ. অন্যতম। পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে, হজরত খান জাহান আলী ১৪১১ সাল থেকে ১৪৫৯ সাল পর্যন্ত সময়কালের মধ্যে তিনি বাগেরহাট অঞ্চল শাসন করেন এবং অসংখ্য মসজিদ, মাদ্রাসা, খানকাহ ও দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করেন। কথিত আছে, তিনি শুধু হাবেলী খলিফাতাবাদ পরগনায় ৩৬০টি মসজিদ ও ৩৬০ দিঘি খনন করেছিলেন, যা তাঁর রাজ্যের একটি অংশমাত্র। এছাড়া আরো বিভিন্ন অঞ্চলে অগণিত মসজিদ, মাদ্রাসা ও দিঘি নির্মাণ করেন। পুরান ঢাকার চকবাজার এলাকায় নসওয়ার গলি মসজিদের শিলালিপি প্রমাণ করে এই এলাকাও তাঁর প্রশাসনিক এলাকার আওতাধীন ছিল।

আধ্যাত্মিক সাধক হিসেবেও হজরত খান জাহান আলীর অবস্থান অনন্য উচ্চতায়। দরবেশ হিসেবে তিনি যেমন মানুষের অন্তরে আধ্যাত্মিক প্রেরণা সঞ্চার করেছিলেন, তেমনি মানুষের বসবাসের যথাযথ বন্দোবস্তের জন্য তৈরি করেছেন অসংখ্য রাস্তাঘাট, মসজিদ ও দিঘি। গড়ে তুলেছেন শহর খলিফাতাবাদ। আজকের দিনে খান জাহান আলীকে এই দেশের অধিকাংশ সাধারণ জনতা স্রেফ একজন দরবেশ হিসেবে জেনে থাকলেও বাংলার দক্ষিণাঞ্চলের সমাজ-বিনির্মাণে হজরত খান জাহান আলীর অবদান এত বেশি যে, তিনি যদি দরবেশ নাও হতেন, তবুও তাঁর সৃষ্টিকর্ম তাঁকে অনন্তকাল অবলীলায় বাঁচিয়ে রাখত।

গ) হাজী বাবা সালেহ (রহ.):

হাজী বাবা সালেহ রহ. শুধু একজন দক্ষ শাসকই ছিলেন না: বরং একজন সর্বজনস্বীকৃত গুণী দরবেশ ও বুযুর্গ ছিলেন। তাঁর নামের শুরুতে হাজী ও বাবা বিশেষণদ্বয় প্রমাণ করে, তিনি কতটুকু গ্রহণযোগ্য ও শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন। হাজী দ্বারা মূলত হজ্বব্রত পালনকারী ব্যক্তিকে বোঝায়, আর বাবা দ্বারা একজন মান্যবর সুফি বা দরবেশকে বুঝায়।

১৪৮১ থেকে ১৫০৬- মোট ২৬ বছর তিনি সোনারগাঁয়ের গভর্নর ছিলেন। এই ২৬ বছরে দুইজন সুলতান ছিলেন, জালালউদ্দিন ফতেহ শাহ এবং আলাউদ্দিন হোসেন শাহ। সচরাচর যেমনটি দেখা যায়, ক্ষমতা পরিবর্তন না হলে, শাসক পরিবর্তন হলে দায়িত্বশীল ব্যক্তিবর্গ, কর্মকর্তাদেরও পরিবর্তন করা হয়। কিন্তু হাজী বাবা সালেহ'র ক্ষেত্রে এমনটি হয়নি। ক্ষমতার বদল হলেও পরিবর্তিত শাসক আলাউদ্দিন হোসেন শাহ তাঁর উপরই ভরসা রেখে তাঁকে গভর্নরের দায়িত্বে রেখে দিয়েছিলেন। এতে প্রমাণিত হয় যে, তিনি একজন দক্ষ ও যোগ্য গভর্নর ছিলেন।

তিনি ১৫০৬ খ্রিস্টাব্দে (৯১২ হিজরি) সোনারগাঁয়ের বন্দর এলাকায় ইন্তেকাল করেন। বাবা সালেহ মসজিদ সন্নিহিত উত্তর-পূর্ব দিকে তাঁকে সমাহিত করা হয়। ইন্তেকালের পূর্বেই বন্দর মসজিদের পাশে তিনি তাঁর সমাধিসৌধ নির্মাণ করে গিয়েছিলেন।[26] বাবা সালেহ'র নামেই বন্দর থানার বর্তমান সালেহনগর এলাকার নামকরণ করা হয়েছে।

স্থাপত্যকলায়

স্থাপত্যের কথা বললেই আসবে হজরত শরফুদ্দীন আবু তাওয়ামাহ'র কথা, যিনি একটি আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয় নির্মাণ করেছিলেন। যদিও তাঁর সে বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো ধ্বংসাবশেষ পাওয়া যায় না, তদুপরি মোগড়াপাড়ায় একটি ইবাদতগাহ'র অস্তিত্ব বিদ্যমান। তাঁর ইসলামী প্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো ধ্বংসাবশেষ না থাকায় স্থাপত্যে তাঁর অবদানের কথা যথার্থরূপে বলা যায় না।

সোনারগাঁয়ে সর্বাধিক স্থাপত্য নির্মাণ করেছেন হাজী বাবা সালেহ। তাঁর তত্ত্বাবধানে তৈরি হওয়া মোট তিনটি মসজিদের সন্ধান এখনো পর্যন্ত পাওয়া গেছে। এগুলো হলো:

---

25. বাংলার ইতিহাস সুলতানী আমল: আবদুল করিম, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৭৭, ২৭৬

26. Khatun, ibid, 149

১) সুলতান জালালউদ্দিন ফতেহ শাহের শাসনামলে নির্মিত নারায়ণগঞ্জ জেলার বন্দর এলাকায় শীতালক্ষ্যা নদীর অববাহিকায় খন্দকারবাগ নামক স্থানে অবস্থিত বন্দর শাহী মসজিদ (১৪৮১)। মসজিদ থেকে প্রাপ্ত আরবি শিলালিপিতে নির্মাতা ও নির্মাণের সময় লেখা আছে। ডক্টর পারভীন হাসান শিলালিপির একটি ইংরেজি অনুবাদ করেছেন।[27]

"Allah the most High, says, 'And the places of worship are for Allah [alone]. So invoke not anyone along with Allah' [Quran 72:18]. The Prophet, peace and blessings of Allah be upon him, says, 'He who builds a mosque, Allah will build for him a palace in Paradise' [Hadith]. This blessed mosque was built by the great Malik [lord] Baba Saleh, in the reign of the Sultan, son of the Sultan, Jalal al-Dunya wal-Din, Abul Muzaffar Fath Shah the Sultan, son of Mahmud Shah the Sultan, may Allah perpetuate his kingdom and sovereignty; on the 1st of the month of Dhul Qada, in the Hijri year of the Prophet 886 [22 December 1481]."

"পরম মহান আল্লাহ বলেছেন: "আর নিশ্চয়ই ইবাদতের স্থানসমূহ আল্লাহরই জন্য, সুতরাং তোমরা আল্লাহর সাথে কাউকে আহ্বান করো না।" (সূরা আল-জিন: ১৮)
রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "যে ব্যক্তি একটি মসজিদ নির্মাণ করে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে একটি প্রাসাদ নির্মাণ করবেন।" (হাদিস)
এই বরকতময় মসজিদ নির্মিত হয়েছিল মহামান্য মালিক বাবা সালেহ'র উদ্যোগে, সুলতানদের পুত্র, মাহমুদ শাহ সুলতানের পুত্র, মহিমায় ভূষিত সম্রাট জালালুদ্দুনিয়া ওয়াদ্দীন আবুল মুজাফফর ফতেহ শাহ সুলতানের শাসনামলে—আল্লাহ তাঁর রাজ্য ও শাসন দীর্ঘস্থায়ী করুন। এর নির্মাণ সমাপ্ত হয়েছিল ৮৮৬ হিজরি সনের জিলকদ মাসের প্রথম দিনে (২২ ডিসেম্বর, ১৪৮১ খ্রি.)।"

২) সুলতান আলাউদ্দিন হোসেন শাহের শাসনামলে ধলেশ্বরী নদীর তীরে অবস্থিত আজিমনগরে নির্মিত আজিমনগর মসজিদ (১৫০৪)। মসজিদ থেকে প্রাপ্ত শিলালিপিতে নির্মাতা হিসেবে হাজী বাবা সালেহ ও নির্মাণের সময় লেখা আছে। শিলালিপিটি আরবিতে লিখিত, যার একটি ইংরেজি অনুবাদ করেছেন অধ্যাপক আবদুল করিম। আরবি মূল ভাষ্য, আবদুল করিমের ইংরেজি অনুবাদ ও বাংলা অনুবাদ দেয়া হলো।[28]

قال النبي صلى الله عليه وسلم عجلو بالصلواة قبل الفوت و عجلو بالتوبة قبل الموت بنى هذا المسجد المبارك الملك المعظم المكرم با با صالح وقد تم بناء هذا المسجد فى اول المحرم سنة ٩١٠

Translation By Abdul Karim

The Prophet, peace and blessings of Allah be upon him, has said, "Make haste to offer prayer, before the time is up, and make haste to seek pardon (of sin) before death". This blessed mosque was built by the exalted and honoured Malik Bābā Ṣāliḥ, and the construction of this mosque was completed on the 1st Muharram 910 A. H. (14 June, 1504 A. D.).

"রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: "সালাত আদায়ে বিলম্ব করো না, সময় ফুরিয়ে যাওয়ার আগে তা সম্পন্ন করো; আর তাওবায় বিলম্ব করো না, মৃত্যু আসার আগে তা সম্পন্ন করো।"
এই বরকতময় মসজিদ নির্মাণ করেছেন মহিমান্বিত ও সম্মানিত মালিক বাবা সালেহ। আর এই মসজিদের নির্মাণকর্ম সমাপ্ত হয়েছিল ৯১০ হিজরি সনের মহররম মাসের প্রথম দিনে (খ্রিস্টাব্দ ১৪ জুন, ১৫০৪ খ্রি.)।"

27. Sultans and Mosques: Perween Hasan, I.B. Tauris, Lindon, New York, 2007, 97

28. Corpus of the Arabic and Persian Inscriptions of Bengal: Abdul Karim, Asiatic Society of Bangladesh, Dhaka, 1992, 268

৩) বন্দর শাহী মসজিদের দক্ষিণ-পশ্চিমে অর্ধমাইল দূরে অবস্থিত বাবা সালেহ মসজিদ (১৫০৫)। এই মসজিদের পাশেই বাবা সালেহের মাজার অবস্থিত। মসজিদ থেকে প্রাপ্ত শিলালিপিতে নির্মাতা ও নির্মাণের সময় লেখা আছে। শিলালিপিটি আরবিতে লিখিত, যার একটি ইংরেজি অনুবাদ করেছেন অধ্যাপক আবদুল করিম। আরবি মূল ভাষ্য ও বাংলা অনুবাদ দেয়া হলো।[29]

قال الله تبارك وتعالى - وان المساجد لله فلا تدعوامع الله احدا - بنى هذا المسجد المبارك في زمن السلطان علاوالدنيا و الدين ابو المظفر حسين شاه السلطان خلد الله ملكه - الملك المعظم المكرم خادم النبى حاجى -الحرمين وزائر القدمين حاجى با با صالح ذى وتسعماية من الهجرة النبوية

Translation By Abdul Karim

Allah the Most Propitious and the Most High has said, "And surely the mosques belong to Allah, so do not call anyone with Allah".86 This blessed mosque was built during the time of the Sultan 'Ala al-dunya w'al-din Abu'l Muzaffar Husain Shah, the Sultan may Allah perpetuate his kingdom; by the exalted and liberal Malik, the servant of the Prophet, the pilgrim to Makka and Madina, the visitor to the two foot-prints (of the Prophet), Haji Baba Salih dated 900 from the Hijra of the Prophet.

"আল্লাহ তাবারক ও তাআলা বলেন: "নিশ্চয়ই মসজিদসমূহ আল্লাহরই জন্য, সুতরাং তোমরা আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে আহ্বান করো না।"

এই বরকতময় মসজিদ নির্মিত হয়েছিল সুলতান আলাউদ্দুনিয়া ওয়াদ্দীন আবুল মুজাফফর হুসাইন শাহ'র শাসনকালে—আল্লাহ তাঁর রাজ্য ও শাসন দীর্ঘস্থায়ী করুন। এ মসজিদের নির্মাতা ছিলেন মহিমান্বিত ও সম্মানিত মালিক হাজী বাবা সালেহ, যিনি ছিলেন নবীজীর খাদেম, মক্কা ও মদিনার হজ্বযাত্রী, নবীজীর পবিত্র দুই পদচিহ্নের (আসরারুল কদমাইন) দর্শনার্থী। নির্মাণকাজ সমাপ্ত হয় নবীজীর হিজরতের নয়শততম (৯০০) সনের দিকে।"

উপরোক্ত ৩টি শিলালিপি থেকে ডক্টর পারভীন হাসান একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আবিষ্কার করেছেন। ১৪৮১ ও ১৫০৪ সালে নির্মিত মসজিদের শিলালিপিতে বাবা সালেহ'র নামের পূর্বে 'হাজী' বিশেষণ নেই। কেবল ১৫০৬ সালের শিলালিপিতে 'হাজী' বিশেষণ যুক্ত হয়েছে। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, ১৫০৪ সালের আগে তিনি হজ সম্পাদন করেননি; ১৫০৪ থেকে ১৫০৬ সালের মধ্যবর্তী সময়ে তিনি হজ সম্পাদন করে আবার সোনারগাঁয়ে ফিরে এসেছিলেন।

কেবল মসজিদই নয়, ইন্তেকালের পূর্বে তিনি নিজের সমাধিসৌধও নির্মাণ করেছিলেন। এই সমাধিসৌধের শিলালিপিও গবেষকরা উদ্ধার করেছেন। অধ্যাপক আবদুল করিম মূল আরবির পাশাপাশি একটি ইংরেজি অনুবাদও পেশ করেছেন।[30]

الله لا اله الا هو ليجمعنكم الى يوم القيامة لاريب فيه - ومن اصدق من الله حديثا - روضة الحاجي الحرمين الزاير القدمين خادم النبى عليه السلام حاجى با با صالح المتوفى تاريخ - ربيع الاول من سنة اثني

Translation By Abdul Karim

O Allah, there is no God but He. He will surely collect you towards the day of Resurrection; there is no doubt in that; and who is more truthful a speaker than Allah"... the tomb of the pilgrim to Makka and Madina, who visited both the footprints, the servant of the Prophet, peace be upon him, Hají Bābā Ṣālih, who died on the date ... .Rabi'I in the year-2.

29. ibid, 274

30. ibid, 275-6

"আল্লাহ- তিনি ছাড়া আর কোনো উপাস্য নেই। তিনি অবশ্যই তোমাদেরকে কিয়ামতের দিনে একত্রিত করবেন- এতে কোনোই সন্দেহ নেই। আর আল্লাহর চেয়ে বেশি সত্যবাদী আর কে আছে?" (কুরআন)
এটি হলো সেই রওজা, হজযাত্রী, হারামাইন শরীফাইন (মক্কা ও মদিনা)-এর যিয়ারতকারী, নবীজীর পবিত্র দুই পদচিহ্নের দর্শনার্থী, সম্মানিত হাজী বাবা সালিহ'র সমাধি। তাঁর ইন্তিকাল সংঘটিত হয়েছিল রবিউল আউয়াল মাসে, হিজরি ২য় সনে।"

শিলালিপিতে ইন্তেকালের বছর স্পষ্টভাবে না থাকলেও অন্যান্য প্রাসঙ্গিক বিষয়কে আমলে নিয়ে আবদুল করিম ৯১২ হিজরি মোতাবেক ১৫০৬-৭ সালে বাবা সালেহ'র ইন্তেকালের বছর ধরে নিয়েছেন। এ নিয়ে গবেষকদের মধ্যে দ্বিমত নেই।
ইন্তেকালের পূর্বেই নিজের সমাধিসৌধ নির্মাণ থেকে বোঝা যায়, স্থাপত্যের প্রতি হাজী বাবা সালেহ'র অনুরাগ ছিলো। এই অনুরাগের বহিঃপ্রকাশ ছিল তিনটি মসজিদ ও নিজের সমাধিসৌধ। উক্ত মসজিদগুলোর কারুকার্যও স্থাপত্যের প্রতি তাঁর অনুরাগের সাক্ষ্য দেয়।

সুফি পরিবার ও রাজপরিবার:
সোনারগাঁয়ের কিছু সুফি পরিবারের সঙ্গে রাজপরিবারের ঘনিষ্ঠতা ছিল। যে কারণে শাসনব্যবস্থায় সুফিদের নৈতিক প্রভাব পড়েছিলো। সুফি পরিবার ও রাজপরিবারের সুসম্পর্কের ফলে যে সেতু তৈরি হয়েছিল, তা সোনারগাঁয়ে ইসলাম প্রচারে একটি মাইলফলক হিসেবে কাজ করেছিলো।

সুলতানী আমলের সবচেয়ে জনপ্রিয় ও প্রভাবশালী সুফি শায়খ আলাউল হক তাঁর বাবার সূত্রে ইলিয়াস শাহী পরিবারের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তাঁর পিতা শায়খ উমার ইবনে আসয়াদ খালিদী ছিলেন পাণ্ডুয়ার সুলতান সিকান্দার শাহের কোষাধ্যক্ষ। এই সূত্র ধরে আলাউল হকের সঙ্গে ইলিয়াস শাহ'র সুসম্পর্ক গড়ে উঠেছিলো। যে কারণে দেখা যায়, শায়খ আলাউল হকের সম্মানে সুলতান ইলিয়াস শাহ একটি মসজিদ নির্মাণ করেন। আলাউল হকের পুত্র হজরত নূর কুতুবুল আলমের ক্ষেত্রেও এই ধারাবাহিকতা বজায় ছিলো। নূর কুতুবুল আলম সুলতানী আমলের অন্যতম সফল শাসক গিয়াসউদ্দীন আযম শাহের সহপাঠী ছিলেন। যখন গিয়াসউদ্দীন আযম শাহ মসনদে আরোহন করেন, তখন নূর কুতুবুল আলমের নিকট থেকে তিনি শাসনব্যবস্থা ও ধর্মীয় বিষয়ে পরামর্শ গ্রহণ করতেন।[31]
শরফুদ্দীন আবু তাওয়ামার পর সোনারগাঁয়ে সবচেয়ে প্রভাবশালী সুফি ছিলেন হজরত ইব্রাহিম দানিশমন্দ। যাঁকে কেন্দ্র করে সোনারগাঁয়ের মোগরাপাড়া সুফিদের একটি মিলনকেন্দ্রে পরিণত হয়েছিলো। তাঁর মাজারের পাশে অনেক সুফিদের মাজার এখনো বিদ্যমান। হোসেন শাহী বংশের শেষ শাসক সুলতান গিয়াসুদ্দিন মাহমুদ শাহের জ্যেষ্ঠ কন্যাকে তিনি বিয়ে করেন। বিয়ের পর জামাতাকে মাহমুদ শাহ সিলেটের তরফ রাজ্যে শাসনকর্তা হিসেবে নিয়োগ করেন। হজরত ইব্রাহিম দানিশমন্দের একটি মেয়ে ছিল, যাকে তিনি বিয়ে দেন বিখ্যাত ঈসা খাঁর সঙ্গে।[32] এই দম্পতির সন্তান মুসা খাঁ, বাংলাকে দিল্লির আধিপত্য থেকে মুক্ত রাখতে মুঘল সেনাপতি ইসলাম খাঁর সঙ্গে বীরদর্পে যুদ্ধ করে যিনি পরাজয় বরণ করেন এবং এর মাধ্যমে বাংলায় মুঘল শাসনের আনুষ্ঠানিক সূচনা হয়।
সুলতানী আমলে সোনারগাঁয়ের সুফি-সমাজ ও রাজপরিবারের সঙ্গে সখ্যতার ফলে শাসনব্যবস্থায় যেমন নৈতিকতার প্রভাব পড়েছে, তেমনি সুফিরাও আরো গণমুখী ও রাজনৈতিকভাবে সচেতন হয়েছেন।

শাসকদের সঙ্গে সুফিদের সম্পর্ক:
ইতোমধ্যে সুলতানী আমলে সোনারগাঁয়ের সুফিদের সঙ্গে শাসকদের সু-সম্পর্কের নজির আমাদের আলোচনায় বারংবার উঠে এসেছে। বিভিন্ন সময় আমরা লক্ষ্য করেছি, বেশ কয়েকজন শাসক সুফিদের সম্মানার্থে তাঁদের দরগায় মসজিদ ও মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেছেন। এছাড়া সুফিদের সাথে শাসকদের সম্পর্কও ছিল অত্যন্ত সোহার্দ্য ও হৃদ্যতাপূর্ণ।
স্বাধীন সুলতানী আমলের প্রতিষ্ঠাতা ফখরুদ্দীন মোবারক শাহ সোনারগাঁ থেকেই দিল্লির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন এবং নিজেকে স্বাধীন হিসেবে ঘোষণা করেন। অর্থাৎ, স্বাধীন সুলতানী আমলের প্রতিষ্ঠাস্থান ও প্রথম রাজধানী সোনারগাঁ। ফলত, ফখরুদ্দিন মোবারক শাহ'র সঙ্গে সুফিদের সম্পর্কের মাধ্যমে বোঝা যাবে, সুলতানী আমলের শাসকদের সঙ্গে সোনারগাঁয়ের সুফিদের সম্পর্ক কেমন ছিল।

31. Social History of The Muslims in Bengal: Abdul Karim, Baitush Sharaf Islamic Research Institute, Chittagong, 1985, 166-7
32. Glimpses of Old Dhaka: Syed Muhammad Taifoor, Dhaka, 1956, 94

সর্বপ্রথম বলতে হয়, ইবনে বতুতার কথা। ইবনে বতুতা তাঁর রেহলাতে বলেছেন, ফখরুদ্দীন মোবারক শাহ সুফিদের জন্য নদী পারাপার ফ্রি করে দিয়েছিলেন। সুফিদের প্রতি তাঁর এমন সুযোগ সুবিধা প্রদানের মাধ্যমেই তাঁর রাজধানী সোনারগাঁয়ের সুফিদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের ব্যাপারে স্পষ্ট ধারণা দেয়।

ইসলামাবাদ অর্থাৎ চট্টগ্রামে প্রথম মুসলমানদের শাসন কায়েম হয় ফখরুদ্দীন মোবারক শাহ'র অধীনে। চট্টগ্রাম বিজয়ে তাঁর যে সেনাবাহিনী ছিল তাতে পীর বদরে আলম এবং কদল খান গাজীও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। অনেকে বলেন, কদল খান গাজী ছিলেন ফখরুদ্দীন মোবারক শাহ'র সেনাপতি। কিন্তু ইতিহাসবিদ আবদুল করিম ভিন্ন মতামত ব্যক্ত করলেও, চট্টগ্রাম বিজয়ে ফখরুদ্দীন মোবারক শাহ'র সঙ্গে যে কদল খান গাজী ও পীর বদরে আলম সরাসরি যুক্ত ছিলেন এ ব্যাপারে তিনি দ্বিমত করেননি।[33] অর্থাৎ সুলতানী আমলে সোনারগাঁকে রাজধানী হিসেবে ঘোষণা করা ফখরুদ্দীন মোবারক শাহ সুফিদেরকে সঙ্গে নিয়েই যুদ্ধ করেছেন এবং পরবর্তীতে তাঁর শাসনামলে সুফিদের জন্য সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করেছেন।

ইলিহাস শাহী বংশের সর্বশেষ শাসক সুলতান জালালুদ্দিন ফতেহ শাহ হজরত ইব্রাহিম দানিশমন্দের দরগাহের পাশে, ১৪৮৪ খ্রিস্টাব্দে একটি মসজিদ নির্মাণ করেন। মসজিদটির শিলালিপি সংরক্ষিত আছে; আবদুল করিম মূল আরবির পাশাপাশি একটি ইংরেজি অনুবাদও প্রকাশ করেছেন।[34]

قال الله تعالى وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احداً - وقال النبى صلى الله عليه وسلم من بنى مسجدا بنى الله له سبعين قصرا في الجنة - بنى هذا المسجد في عهد السلطان الاعظم المعظم جلال الدنيا والدين ابوالمظفر فتح شاه السلطان ابن محمود شاه السطان خلد الله ملكه وسلطانه - باني المسجد مقرب الدولة ملك الدين السلطاني جامدار غير محلى و سرلشكر و وزير اقليم معظما باد و نيز مشهور محمودآباد و سرلشكر تهانه لاوڈ - وكان ذلك فى التاريخ من المحرم سنة تسع وثمانين وثمانماية

Translation By Abdul Karim

Allah, the Most High says, "Verily the mosques belong to Allah, so do not call any one with Allah". And the Prophet, peace and blessings of Allah be upon him, has said, "He who builds a mosque Allah will build for him seventy palaces in Heaven". This mosque was built during the time of the great and exalted Sultan Jalāl al-dunya wa'l-din Abū'l Muzaffar Fath Shah, the Sultan, son of Mahmud Shah, the Sultan, may Allah perpetuate his kingdom and sovereignty. The builder of the mosque is Muqarrab al-daulat Malik... al-din, the governor, the extra-ordinary keeper of the wardrobe, and Sar-i-Lashkar and Wazir of Iqlim Mu'azzamabad, also known as Mahmudabad, and Sar-i-Lashkar of Thana Laud. This (i.e. the construction of the mosque) took place in the month of Muharram of the year 889 A. H. (February, 1484 A. D.).

"আল্লাহ তা'আলা বলেন: "নিশ্চয়ই মসজিদসমূহ আল্লাহর জন্যই, অতএব তোমরা আল্লাহর সঙ্গে কাউকে আহ্বান করো না।"
রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি একটি মসজিদ নির্মাণ করেন, আল্লাহ তা'আলা তাঁর জন্য জান্নাতে সত্তর প্রাসাদ নির্মাণ করবেন।"
এই মসজিদ নির্মিত হয়েছিল মহাসুলতান, মহিমান্বিত সম্রাট জালালুদ্দুনিয়া ওয়াদ্দীন আবুল মুজাফফর ফতেহ শাহ সুলতান, যিনি মাহমুদ শাহ সুলতানের পুত্র—আল্লাহ তাঁর রাজ্য ও কর্তৃত্ব চিরস্থায়ী করুন; তাঁর শাসনামলে মসজিদটির নির্মাতা ছিলেন মুকররাবুদ্দৌলা মালিক উদ্দীন, যিনি ছিলেন সুলতানি দরবারের অতি নিকটবর্তী, জামাদার (বিশেষ পোশাক ও সম্ভার রক্ষক), গৌরবোজ্জ্বল সেনাপতি (সর-ই-লশকর), ওজির এবং ইকলিম মু'আজ্জমাবাদ তথা মাহমুদাবাদ'র প্রধান প্রশাসক। তিনি একইসাথে থানাহ লাউদ'র সেনাপতি হিসেবেও খ্যাতিমান ছিলেন। এই মসজিদ নির্মাণ সমাপ্ত হয় ৮৮৯ হিজরি সনের মহররম মাসে (খ্রিস্টীয় ফেব্রুয়ারি ১৪৮৪)।"

33. করিম, ১৯৭৭, ১৬৫-৮
34. Karim, 1992, 203-4

হজরত ইব্রাহিম দানিশমন্দের পাশেই কেন সুলতান জালালুদ্দিন ফতেহ শাহ মসজিদ নির্মাণ করেছিলেন? মোগরাপাড়ায় হজরত ইব্রাহিম দানিশমন্দের আস্তানা ও দরগাহকে কেন্দ্র করে অনেক সুফিদের সমাগম হয়েছিলো। এবং সুফিদের সমাগমের প্রতি শ্রদ্ধাবশতঃই যে সুলতান এই মসজিদ নির্মাণ করেছিলেন তা অস্বীকারের সুযোগ নেই।

শায়খ আলাউল হকের সঙ্গেও সুলতান ইলিয়াস শাহের সুসম্পর্ক ছিল। ইলিয়াস শাহ হজরত আলাউল হকের সম্মানে একটি মসজিদ নির্মাণ করেন।[35] ইলিয়াস শাহের নাতি, বিখ্যাত শাসক গিয়াসউদ্দীন আযম শাহের শিক্ষকও ছিলেন আলাউল হক।[36]

শায়খ আলাউল হকের পুত্র হজরত নুর কুতুবুল আলম সুলতান গিয়াসউদ্দীন আযম শাহের সহপাঠী ছিলেন। রাজ্য পরিচালনা করার ক্ষেত্রে সুলতান আযম শাহ হজরত নুর কুতুবুল আলমের খানকায় আসতেন এবং হযরতের কাছ থেকে উপদেশ ও পরামর্শ গ্রহণ করতেন। জানা যায়, সুলতান আলাউদ্দীন হোসেন শাহ হজরত নুর কুতুবুল আলমের দরগাহের জন্য লাখেরাজ সম্পত্তি প্রদান করেন।[37] অর্থাৎ, নুর কুতুবুল আলমের সম্মানার্থেই আলাউদ্দীন হোসেন শাহ লাখেরাজ দিয়েছেন। এখানে সম্মানের পাশাপাশি ঋণের প্রসঙ্গও চলে আসে। আলাউদ্দীন ফিরোজ শাহকে হত্যা করে রাজা গণেশ যখন বাংলার শাসনক্ষমতা থেকে মুসলমানদের উৎখাত করতে চাইলো এবং মুসলমানদের উপর চরম জুলুম শুরু করলো তখন হজরত নূর কুতুবুল আলমের সরাসরি হস্তক্ষেপে সুলতানী আমলের ধারাবাহিকতা অব্যাহত থাকে। হজরত নুর কুতুবুল আলমের পুনরুদ্ধারকৃত ধারাবাহিকতারই ফসল সুলতান সুলতান আলাউদ্দীন হোসেন শাহ।

সুলতানী আমলের এক অনন্য চরিত্র হজরত খান জাহান আলী। দক্ষিণবঙ্গে তাঁর প্রতিষ্ঠিত রাজ্য খলিফাতাবাদও প্রশাসনিকভাবে সোনারগাঁয়ের অধীনে ছিল। হজরত খান জাহান আলী সুলতান গিয়াসউদ্দীন আযম শাহের সময়সাময়িক ছিলেন এবং সুলতানের অধীনে ওয়াজিরের গুরু দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়াও, খান জাহান আলী নিঃসন্তান থাকায় সুলতান নাসির উদ্দীন মাহমুদ শাহকে লালন-পালনও করেছিলেন।[38] সুলতান নাসির উদ্দীন মাহমুদ শাহের আমলেই তিনি রাজদরবার থেকে 'উলুঘ' উপাধীতে ভূষিত হন এবং বাগেরহাট অঞ্চলে শাসনকার্য পরিচালনা করেন।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে সহজেই অনুমান করা যায় যে, সুলতানী আমলে সুফিদের সাথে শাসকদের কেমন সুসম্পর্ক ছিল। পাশাপাশি এটাও উপলব্ধি করা যায় যে, সুলতানরা সুফি-দরবেশদেরকে কতটুকু শ্রদ্ধা এবং মান্য করতেন।

উপসংহার:

সুলতানী আমলের প্রথম রাজধানী সোনারগাঁ। মুঘল সেনাপতি ইসলাম খাঁর কাছে মুসা খাঁর পরাজয়ের মাধ্যমে বাংলায় মুঘল শাসনের সূচনা পর্যন্ত পুরো সুলতানী আমল জুড়েই সোনারগাঁ ছিল বাংলার অন্যতম নেতৃস্থানীয় রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কেন্দ্র। লক্ষ্যনীয় যে, স্বাধীন সুলতানী আমলের সূচনা যেমন হয়েছে সোনারগাঁয়ে, তেমনি যে মুসা খাঁর মাধ্যমে বাংলায় স্বাধীন শাসনব্যবস্থার সমাপ্তি ঘটেছে তিনিও সোনারগাঁয়ের সন্তান। মোগরাপাড়ায় আস্তানা করা সুফি হজরত ইব্রাহিম দানিশমন্দের রক্ত যার ধমনীতে বইছিলো।

ভৌগলিক ও রাজনৈতিক সুবিধার কারণে সোনারগাঁয়ে আগমন করেছেন বহুসংখ্যক সুফি। সোনারগাঁ রাজধানী হবার আগেই হজরত শরফুদ্দীন আবু তাওয়ামা এটিকে আন্তর্জাতিক শহরের মর্যাদায় উন্নীত করেছেন। পরবর্তীতে রাজধানী ঘোষণার পর সোনারগাঁয়ের ধর্ম, সমাজ ও সংস্কৃতি গঠনে এবং শাসনব্যবস্থায় নৈতিক প্রভাব রাখতে সুফিগণ নিরলস পরিশ্রম করেছেন। সোনারগাঁয়ের ইসলাম প্রচার তো বটেই, স্থানীয় সমাজ ও সংস্কৃতির বিকাশও ঘটেছে সুফিদের মাধ্যমে। পুরো সুলতানী আমল জুড়েই শাসকদের সঙ্গে সুফিদের সুসম্পর্ক ছিলো। যার ফলে কোনো শাসক জনগণের উপর তেমন জুলুমের সুযোগ ও সাহস পাননি। সুফিগণ শাসকদেরকে উত্তম পরামর্শ দিয়েছেন এবং শাসকরাও পরামর্শ মোতাবেক আমল করেছেন। অন্তত সুলতানী আমলের কোনো শাসক সীমালঙ্ঘন করেছে এমন কোনো বর্ণনা ইতিহাসে নেই। এর পেছনে অবশ্যই সুফিদের অবদান অনস্বীকার্য।

সোনারগাঁয়ের ইতিহাস ও ঐতিহ্য নিয়ে আমাদের গর্বের অন্ত নেই। গর্বের পাশাপাশি সেই ঐতিহ্য যারা নির্মাণ করেছেন তাঁদের পরিচয় অনুসন্ধান করা জরুরী। বাংলায় ইসলাম প্রচার ও প্রসারে সুফিদের নেতৃত্বের বিষয়ে প্রায় সকলে ওয়াকিবহাল থাকলেও সোনারগাঁয়ের মতো সমৃদ্ধ একটি জনপদ গড়ে তোলার পেছনেও যে সুফিদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে তা এখনো পর্যন্ত জনপরিসরে অজ্ঞাত বিষয়। কিন্তু ঐতিহ্য নির্মাতাদের অন্ধকারে রেখে সামনে এগিয়ে যাওয়া কঠিন। বর্তমান বাংলাদেশ রাষ্ট্রের যে ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে তার বাস্তবায়ন সম্ভব হবে না যদি না দেশের সোনালী অতীত নির্মাতাদের কার্যক্রম সম্পর্কে অজ্ঞতা থেকে যায়। সোনারগাঁকে সমৃদ্ধ জনপদ হিসেবে গড়ে তোলার পেছনে গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম আঞ্জামা দেয়া সুফিগণ বাংলাদেশকে একটি সমৃদ্ধ রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে তোলার পেছনে অনুপ্রেরণা যোগাতে পারে।

---

35. Karim, 1959, 53
36. Khatun, ibid, 32
37. করিম, ১৯৭৭, ৫৫
38. Khatun, ibid, 41

গ্রন্থপঞ্জি:

১. *Iqlim Sonargaon History Jurisdiction Monuments*: Habiba Khatun, Academic Press and Publishers Library, Dhaka, 2006

২. *Social History of the Muslims in Bengal*: Dr. Abdul Karim, The Asiatic Society of Pakistan, Dacca, 1959

৩. *Social History of the Muslims in Bengal*: Dr. Abdul Karim, Baitush Sharaf Islamic Research Institute, Chittagong, 1985

৪. *The Calcutta Review*, 1939, Shaykh Sharaf-ud-Din Ahmad Yahya of Munayr: Rahman, S. K.

৫. *Glimpses of Old Dhaka*: Sayed Muhammed Taifoor, The Saogat Press, Dacca, 1956

৬. *Sultans and Mosques*: Perween Hasan, I.B. Tauris, Lindon, New York, 2007

৭. *Corpus of the Arabic and Persian Inscriptions of Bengal*: Abdul Karim, Asiatic Society of Bangladesh, Dhaka, 1992

৮. *শরফুদ্দীন আবু তাওয়ামাহ, শরফুদ্দীন ইয়াহইয়া মুনায়রী ও নুর কুতুবুল আলম (র:) সাধকত্রয়ের জীবন ও কর্মের উপর তুলনামূলক সমীক্ষা*: মুহাম্মদ আব্দুল লতিফ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০১

৯. *হজরত আবু তাওয়ামাহ*: মফিজ উদ্দীন আহমদ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৮৭

১০. *বাংলার ইতিহাস*: আবদুল করিম, বড়াল প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৯

১১. *বাংলার ইতিহাস সুলতানী আমল*: আবদুল করিম, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৭৭

১২. *মুহম্মদ এনামুল হক রচনাবলী চতুর্থ খণ্ড*: মনসুর মুসা সম্পাদিত, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯৫

১৩. *মুহম্মদ এনামুল হক রচনাবলী দ্বিতীয় খণ্ড*: মনসুর মুসা সম্পাদিত, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯৩

১৪. *হজরত শাহজালাল (রহ.)*: দেওয়ান নুরুল আনোয়ার হোসেন চৌধুরী, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৮৭

১৫. *বাংলার ইতিহাস (রিয়াজ-উস সালাতীনের বঙ্গানুবাদ)*: আকবরউদ্দীন, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৭৪

১৬. *বাংলাপিডিয়া*, ইবরাহিম দানিশমন্দ, সাইয়্যিদ: মুয়াযযম হোসেন খান